# সংস্কৃতির সংকট ও ফ্যাসিবাদ

*সাংস্কৃতিক অবক্ষয় আজ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। এটা কেবল সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয় ডেকে এনেছে তাই নয়, তা ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জমি তৈরি করে দিচ্ছে। এখানেই নিহিত রয়েছে এক ভয়াবহ বিপদ। বর্তমান প্রবন্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিপদের মূল চিহ্নিত করেছেন, তার রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ ও অস্তিত্ববাদ হল মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের এই যুগে মানবতাবাদেরই এপিঠ-ওপিঠ। এই আসন্ন বিপদ মোকাবিলা এবং নির্মূল করার উদ্দেশ্যে কীভাবে সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ও শক্তিশালী করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন।*

আমাদের দেশের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন আজ দ্বিমুখী সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক বুর্জোয়াশ্রেণী দেশের পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বিরোধী 'থিওরি অব বিলিফ' (অন্ধ বিশ্বাস)-এর উপর ভিত্তি করিয়া নানা প্রকার অতিপ্রাকৃতবাদ, ঈশ্বরবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, জাতীয় ঐতিহ্যের নামে রিভাইভালিজম (পুনরুজ্জীবনবাদ)-এর চর্চা দ্বারা নিয়ত গণমনকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অপরদিকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের বেশিরভাগই আজ দেশে পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর — সংশয়বাদ, অনিশ্চয়তাবাদ, ফেটালিজম (অদৃষ্টবাদ), লজিক্যাল পজিটিভিজম প্রভৃতি নানা প্রকার প্রচ্ছন্ন বুর্জোয়া ভাবধারার দ্বারা ক্রমশঃই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতেছেন। এমনকী মার্কসবাদী বলিয়া পরিচয়দানকারী সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও অধিকাংশকেই দেখা যাইতেছে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ব্যক্তিবাদ ও অস্তিত্ববাদ (এগজিসটেনসিয়ালিজম) দ্বারা ক্রমেই প্রভাবিত হইয়া পড়িতেছেন। ফলে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংকট আরও তীব্র রূপ ধারণ করিতেছে। তাই এই দ্বিমুখী সংকটের হাত হইতে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে মুক্ত করিতে হইলে — আজিকার বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় — প্রগতিশীল সংস্কৃতির চরিত্র ও রূপ কী তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দরকার।

এই দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করিতে হইলে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের সর্বপ্রথমেই স্থির করিতে হইবে সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি কী হইবে? ভাববাদী দর্শনসমূহ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে কোন দর্শনের সহায়তায় আমরা ঘটনাসমূহকে (ফেনোমেনা) সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম? কোনও একজন ব্যক্তি, তা তিনি যেই হোন না কেন, তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বিশ্বাসের চাইতে ঐতিহাসিক যুক্তি-বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যদি সত্যানুসন্ধানের সর্বোত্তম উপায় হয়, তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনই মনুষ্যসমাজের হাতে সর্বপ্রথম একমাত্র বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার, যাহার সহায়তায় ঘটনাসমূহের সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের মনে রাখা দরকার যে, সমাজের অভ্যন্তরস্থ পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ও সামগ্রিকভাবে সমাজমনের সাথে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত সংঘাতের মধ্য দিয়াই মানুষের মনোজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে ও ক্রমশ বিকাশলাভ করিতেছে। মানুষের এই মননশীলতার সামগ্রিক ও সুন্দরতম প্রকাশই হইতেছে সংস্কৃতি। শিল্প, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি এই সংস্কৃতির বাহন। একথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিলে চলিবে না যে, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, এক কথায় সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ উপরিকাঠামো, সুপারস্ট্রাকচার — 'আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার আর দ্য সুপারস্ট্রাকচার বিল্ট অন এ ডেফিনিট ইকনমিক বেসিস অব দ্য সোসাইটি'।

সমাজে প্রত্যেকটি মানুষ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। মানুষে মানুষে

সম্পর্ক তাই মূলত উৎপাদন সম্পর্ক — অর্থাৎ উৎপাদন ও নিত্য নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনেই মানুষে মানুষে সর্বপ্রথম সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা পছন্দ করি বা না করি, যেহেতু আমাদের সমাজ আজও একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, সেইহেতু প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তা, ভাবনা ও ধারণাগুলিও কোনও না কোনও শ্রেণীস্বার্থের সাথে যুক্ত থাকিতে বাধ্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী নিরপেক্ষ চিন্তা, ভাবনা, ধারণার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। শ্রেণী নিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারণা শুধুমাত্র অবাস্তব ও অজ্ঞতার পরিচায়কই নহে, উপরন্তু ইহা দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ একটু বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়িবে যে, যে সকল সংস্কৃতিবিদ্‌রা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে শ্রেণী নিরপেক্ষ সংস্কৃতির কথা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের সৃষ্ট শিল্প, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের অজানিতভাবেই তাঁহারা কোনও না কোনও শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে সেই শ্রেণীর চিন্তা ও দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া থাকেন। তাঁহারা সচেতনভাবে ইহা করেন নাই — এইটুকু মাত্র তাঁহাদের সান্ত্বনা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্ট সংস্কৃতি শ্রেণী নিরপেক্ষ — এই দাবি করা কিছুতেই চলিতে পারে না। কারণ সামাজিক চিন্তা ব্যক্তির মধ্য দিয়া যে রূপ পরিগ্রহ করে (পারসনিফিকেশন অব সোস্যাল থিঙ্কিং) তাহাকেই আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলিয়া থাকি। আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই সামাজিক চিন্তা পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির চিন্তা, ভাবনা, ধারণা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এমতাবস্থায় আমাদের ভাল না লাগিলেও ইহা অস্বীকার করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই যে, মানুষ মাত্রই, তা সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কোনও না কোনও শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে বাধ্য। কাজেই অজানিতভাবে হইলেও, যেখানে কোনও না কোনও শ্রেণীর চিন্তা, ভাবনা ও স্বার্থকে শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া রূপায়িত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, সেক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা ও চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান, ধারণাকে রূপ দেওয়া সমাজ প্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিয়া লইয়া সচেতনভাবে সেই শ্রেণীর চিন্তা, ভাবনা, ধারণা ও স্বার্থকে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মধ্য দিয়া রূপায়ণের চেষ্টা করা প্রত্যেকটি সৎ সংস্কৃতিবিদের কর্তব্য। অবশ্য যদি তিনি নিজেকে সৎ ও প্রগতিবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে চান।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করিবার সময় একথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের সমাজও একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ইহার একদিকে বুর্জোয়াশ্রেণী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা, অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অগণিত শোষিত জনসাধারণ। বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। একের চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান, ধারণা ও দর্শনের দ্বারা অপর শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধি অসম্ভব। তাই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহারা যেমন পরস্পর সংঘর্ষশীল, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তেমনি একশ্রেণীর ভাবনা, ধারণা, চিন্তা ও মূল্যবোধ, অপরশ্রেণীর ভাবনা, ধারণা, চিন্তা ও মূল্যবোধের সহিত নিয়ত সংগ্রামশীল। যে সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তা, ভাবনা, ধারণা ও মূল্যবোধকে আদর্শ স্থানীয় হিসাবে তুলিয়া ধরা হইতেছে এবং যাহার দ্বারা আসলে বর্তমান পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহাকেই আমরা বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি আখ্যা দিয়া থাকি। এবং যে সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনসাধারণের নূতন মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও দর্শনকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে তাহাকেই আমরা সর্বহারা বা প্রগতিশীল সংস্কৃতি বলিয়া থাকি। রাষ্ট্রযন্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর করায়ত্ত থাকার ফলে একদিকে যেমন বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের সুযোগ-সুবিধা সর্বহারা সংস্কৃতির চেয়ে বেশি অপরদিকে তেমনি বুর্জোয়া সংস্কৃতি অপেক্ষা সর্বহারা সংস্কৃতির মান অনেক উন্নততর, প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক হওয়ার দরুন এবং সর্বহারা সংস্কৃতির পিছনে সমাজ প্রগতির বিশ্বজনীন আবেদন থাকার ফলে যদি সঠিকভাবে সর্বহারা বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে বর্তমান শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার চাপে পিষ্ট জনসাধারণের জীবনকে প্রগতিশীল তথা সর্বহারা সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত করা মোটেই কষ্টকর নয়। অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে যেখানে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়িয়া উঠিতেছে এবং রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদী লক্ষণগুলি ক্রমশ প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে, এমনকী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপরেও ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তখন বড় বড় বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী নামে পরিচিত দলগুলি ও তাহাদের দেখাদেখি বেশিরভাগ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তুলনামূলকভাবে ভারতীয় পুঁজিবাদের অনগ্রসরতার দোহাই দিয়া

'ফ্যাসিবাদ আমাদের মতো একটি অনগ্রসর দেশে প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব' এইরূপ মনগড়া তত্ত্বের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া শুধু যে ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না তাহাই নহে, উপরন্তু জাতীয় ঐক্য, জাতীয় ঐতিহ্য, যান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধ, শান্তি ও অশান্তির বুলি কপচাইয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই কার্যত ফ্যাসিবাদী ভাবধারার প্রভাব বিস্তার লাভে সহায়তা করিতেছেন। ফ্যাসিবাদ ও ইহার যথার্থ চরিত্র ও রূপ সম্বন্ধে ইঁহাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণার একান্ত অভাব রহিয়াছে। ইঁহারা ফ্যাসিবাদ বলিতে শুধুমাত্র নগ্ন ডিক্টেটরি শাসনব্যবস্থা বুঝিয়া থাকেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মুখোশের অন্তরালেও যে পুরাপুরি ফ্যাসিবাদ প্রবর্তন সম্ভব, ইহা বুঝিতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। তাহা না হইলে সহজেই ইঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, গত যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পরাজয় ঘটিলেও ফ্যাসিবাদ আজও ধ্বংস হয় নাই। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বাজারের সমান্তরাল সমাজতান্ত্রিক বাজার সৃষ্টি হওয়ার অনিবার্য ফলস্বরূপ ফ্যাসিবাদ আজ প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথ বাহিয়া জার্মানিতে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (ন্যাশনাল সোস্যালিজম) গড়িয়া উঠিয়াছিল, গান্ধীবাদের বর্তমান ভাষ্যকারেরাও ফ্যাসিবাদী অর্থনীতিবিদ কোন্‌জ-এর 'অ্যাটেম্‌প্‌ট টু ইনট্রোডিউস সোস্যালিস্ট প্ল্যানিং উইথ দ্য কনসেন্ট অব বিগ বিজনেস' (বৃহৎ পুঁজিপতিদের অনুমতি সাপেক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রচেষ্টা) — এই নীতির অনুরূপ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনে ব্যাপৃত। আজ যে পুঁজিবাদের অনগ্রসরতা রহিয়াছে তাহা দূর করিয়া বিশ্বের বাজার দখলের উদ্দেশ্যে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটানোই যে এই সমস্ত পরিকল্পনার পিছনকার আসল লক্ষ্য এবং যে কোনও সময় অনুকূল পরিবেশে ইহা যে সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদীরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে — ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকিলে ইহা বুঝিতে এই সমস্ত তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিবাদীদের অসুবিধা হইত না। ফ্যাসিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপূরক হিসাবে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। গণতন্ত্রের গালভরা বুলি কপচানো সত্ত্বেও আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদী লক্ষণগুলি ক্রমেই প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে। এবং দেশের বুর্জোয়া সংস্কৃতিতেও ইহার প্রতিফলন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই দিনের পর দিন নগ্নরূপ ধারণ করিতেছে। একদিকে 'আমাদের রাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' — ইহা জোরগলায় প্রচার চালানো হইতেছে, অপরদিকে রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বপ্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মাচরণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া চলিয়াছেন, এবং তাঁহাদের এই আচরণের সপক্ষে তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষতার এক অভিনব ব্যাখ্যা দিতেছেন। ইঁহাদের মতে, তাহাকেই নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয় — যে রাষ্ট্র কোনও একটি বিশেষ ধর্মের রাষ্ট্র নয়; এবং যে রাষ্ট্র সকল ধর্মের বিকাশলাভে সমান উৎসাহ ও পূর্ণ সুযোগ দান করিয়া থাকে। কী অদ্ভুত ইঁহাদের ব্যাখ্যা! ধর্মনিরপেক্ষ কথাটার অর্থ যে পার্থিব এবং ইহার দ্বারা যে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি বোঝান হইয়া থাকে তাহা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন। আমাদের দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর চারিদিক হইতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অতিপ্রাকৃত ভাবধারার চর্চা পুরাদমে চলিতেছে। সার্বজনীন পূজা, ধর্ম-মিছিল, কীর্তন-মিছিল, তথাকথিত 'যুগাবতার'দের আবির্ভাব অথবা তিরোভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি, ধর্মপুস্তক পাঠচক্র প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান প্রসার ও ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই সকলের নজরে পড়িয়াছে। একদিকে মানবতা, গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রভৃতির কথা বলিয়া হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, বিধবা বিবাহ আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করা হইতেছে, অপরদিকে প্রাচীনযুগকে আর কোনওমতেই ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয় জানিয়াও সেই পুরানো সতীত্ববোধ, হিন্দুনারীর প্রাচীন আদর্শকে প্রকৃত আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হইতেছে ও তাহার পিছনে সমর্থন জোগান হইতেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'আদর্শ গৃহিণী' হইবার এই আহ্বানের সাথে হিটলারের 'গো ব্যাক টু কিচেন অ্যান্ড বি এ গুড মাদার' এই আহ্বানের প্রভেদ কোথায়? মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়াও রাজনীতির সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যে সংযোগ ঘটাইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে যুক্তিবিজ্ঞান বিরোধী ভাববাদী ও নানাপ্রকার অতিপ্রাকৃত চিন্তাধারা ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমানে বেশিরভাগ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের হোতা পুরোহিত সম্প্রদায় নহে, দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারাই এইসব অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাতে পরিণত হইয়াছেন। আর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে এই যে, শুধু যে কংগ্রেসী নেতারাই রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংযোগ সাধনে ব্রতী হইয়াছেন তাহাই নহে, তথাকথিত

বামপন্থী ও সাম্যবাদী নেতারাও উপরোক্ত নীতিকে পপুলার মিন্‌স (জনপ্রিয় উপায়) হিসাবে গ্রহণ করিয়া মূল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদিকা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বাস্তব তাগিদে একদিকে বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল (কারিগরি) দিকের চর্চা হইতেছে, অপরদিকে ভাবরাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞান বিরোধী 'থিওরি অব বিলিফ'-এর উপর ভিত্তি করিয়া অতিপ্রাকৃতবাদ, ঈশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা প্রকার ভাববাদী দর্শনের চর্চা চলিতেছে। একই সাথে টেকনোলজিক্যাল (প্রযুক্তিগত) উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চর্চা এবং শিল্প, সাহিত্য ও মূল্যবোধ প্রভৃতি মানুষের ভাবরাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের চর্চা দেশে পুরাপুরি ফ্যাসিবাদ গড়িয়া উঠার ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। আমার মতে 'দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ' (লেখকের ১৯৪৯ সালের একটি বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত)।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে থিওরি অব অ্যাবসলিউটিজম-এর প্রচার, শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণীমিলন ও বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির প্রচার, বিশ্বমানবতার নামে কার্যত সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিকে অস্বীকার করা, উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রচার ও সর্বোপরি জাতীয় ঐতিহ্যের নামে রিভাইভালিজম-এর চর্চার দ্বারা সমস্ত প্রকার বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া কুসংস্কারের জাবর কাটিয়া চলাই আমাদের দেশের নয়া ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হইয়া দেখা দিয়াছে। 'দ্য মোর দ্য ব্লাইন্ডনেস, দ্য মোর দ্য ফ্যানাটিসিজম' (যত বেশি অন্ধতা, তত বেশি উগ্রতা) এই কথা বুর্জোয়াদের ভালভাবে জানা আছে বলিয়াই তাহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া সংযম, শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে অন্ধ আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধের মনোভাব গড়িয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এইগুলি না হইলে কোনও দেশেই সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। কারণ অন্ধ আনুগত্য, যান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধ ও সর্বপ্রকার কুসংস্কারই হইতেছে ফ্যাসিবাদের বুনিয়াদ। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও মতবিনিময়ের ইচ্ছা ও মনোভাব একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রতিটি বিতর্কমূলক ব্যাপারেই হয় অতিবুদ্ধির দাম্ভিকতা, শক্তিমত্ততা, না হয় সেই একই সুর — বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ধ্বনিত হইতেছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল, বিশেষ করিয়া বড় বড় দলগুলির কর্মী ও নেতাদের মধ্যে ফিলজফিক্যাল টলারেন্স-এর (দার্শনিক সহনশীলতা) অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। বিরোধী মত ও সমালোচনাকে ধৈর্যের সহিত পর্যালোচনা করিবার মনোবৃত্তি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও গোঁড়ামির মনোভাব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। এমনকী অপর দলকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেমন খুশি প্রতিনিয়ত মিথ্যা রটনার কাজেও ইঁহাদের অনেকেই বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের এইসব আচরণ গোয়েবলস্ ও মুসোলিনিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইঁহারা হয়ত অনেকেই জানেন না যে, এই সমস্ত মনোভাবই জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্টসুলভ মনোভাব বৃদ্ধির কাজে কী ভাবে সহায়তা করিতেছে। সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগে যে মানবতাবাদের মূল্যবোধ আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদিগকে অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের রুচি ও নৈতিকতার মানকে নিয়ন্ত্রিত করিত, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা দখল ও বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর সেই মানবতাবাদের আদর্শ শোষকশ্রেণীর হাতে আজ একটি সুবিধাবাদী অস্ত্রে (প্রিভিলেজ) পরিণত হইয়াছে। এই মানবতাবাদের আদর্শ, নীতি ও মূল্যবোধই আজিকার বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় জীবনে ফ্যাসিস্টসুলভ মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিতেছে। আমি জানি একথা অনেকের কানেই অদ্ভুত শুনাইবে, কিন্তু ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের আমি শুধু এইটুকু অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন ফ্যাসিবাদ ও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ (এগজিসটেনসিয়ালিজম) যে এই বিংশ শতাব্দীর বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবতাবাদেরই দুইটি বিশেষ বিপরীত ধরনের অভিব্যক্তি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন। কাজেই আজ আর মানবতাবাদী মূল্যবোধ অতীতের ন্যায় সমাজপ্রগতিতে ও সমাজের মানসিক গঠনকে বিপ্লবমুখী করিতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। অথচ যে নূতন নীতি ও মূল্যবোধ সাম্যবাদী আদর্শকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠা দরকার তাহা এখনও পর্যন্ত সমাজজীবনে তেমনভাবে গড়িয়া উঠিতে ও প্রসারলাভ করিতে পারিতেছে না। সাম্যবাদীদের আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুর্বলতাই

ইহার প্রধান কারণ। এমতাবস্থায় নীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমাজজীবনের অভ্যন্তরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই আজিকার দিনে সাংস্কৃতিক সংকটের প্রধান কারণ।

সমস্ত ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের মূল সুরটি হইল বিশ্বাস — 'দি এসেন্স অব অল রিলিজিয়নস ইজ ব্লাইন্ড ফেথ ইন পার্সোনিফায়েড অর অ্যাবস্ট্রাক্ট সুপারন্যাচারাল ফোর্সেস একসারসাইজিং কন্ট্রোল ওভার ওয়ার্লড্‌লি থিংস্ অ্যান্ড ইভেন্টস।' বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার এই অন্ধবিশ্বাসের ভিতকে ধুলিসাৎ করিয়া দেয় বলিয়াই আমাদের দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী অপরাপর দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর মতোই অতীতের প্রগতিশীল চরিত্র হারাইয়া আজ অধ্যাত্মবাদের প্রচারকে পরিণত হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের দুর্দশা ও অত্যাচারের সঠিক কারণ এবং সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইতে না পারে তাহার জন্য চিরকালই শাসক ও শোষক সম্প্রদায় ধর্মের আফিং খাওয়াইয়া জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করিবার চক্রান্ত করিয়া থাকে। তাই ফ্যাসিবাদীদেরও ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসকে জিয়াইয়া রাখিতে হইলে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। 'ডকট্রিন বিউটিফুলি ডিফাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুলি ইলিউসিডেটেড উইথ হেডলাইনস অ্যান্ড প্যারাগ্রাফস মাইট বি ল্যাকিং, বাট সামথিং ওয়াজ টু টেক ইট্‌স্ প্লেস, সামথিং মোর ডিসিসিভ — ফেথ' (এটা (অধ্যাত্মবাদ) হয়তো খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত বা শিরোনাম ও প্যারাগ্রাফ করে প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশিত তত্ত্ব নয়, কিন্তু তার বিকল্প তো চাই, সেই বিকল্প আরও অমোঘ — তাহল বিশ্বাস) — মুসোলিনির এই কথার মধ্যে যে সুর ধ্বনিত হয়, আমাদের দেশের নেতাদের ও বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদদের কণ্ঠেও মূলত একই সুর ধ্বনিত হইতেছে। ভারতবর্ষে 'থিওরি অব বিলিফ'-এর উপর ভিত্তি করিয়াই একদিন গান্ধীবাদ গড়িয়া উঠিয়ছিল। তাই অধ্যাত্মবাদ গান্ধীবাদেরও দার্শনিক ভিত্তি। আর গান্ধীবাদই হইতেছে ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ স্বরূপ। গান্ধীবাদ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা সম্ভব নয় বলিয়া গান্ধীবাদের উপর বহুপূর্বে লিখিত আমার একটি প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিলাম ঃ

'গান্ধীইজম ইজ এ সাবলিমেটিক ট্রান্সফর্মেশন অব বুর্জোয়া ক্লাস ইন্সটিংক্ট, অরিজিনেটেড থ্রু দ্য প্রসেস অব ফিউশন বিটুইন দ্য সেন্স অব বুর্জোয়া হিউম্যানিস্ট মরাল ভ্যালুজ অ্যান্ড অ্যান্টি-ওয়ার্কিং ক্লাস ফিয়ার কমপ্লেক্স অব রেভোলিউশন অব গান্ধীজি।' (১৯৪৮)। যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদ (গান্ধীবাদ) কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও শ্রেণীসমন্বয়ের মতবাদের দ্বারা শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধিতা পূর্বেও করিয়াছে এবং বর্তমানেও করিতেছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যত আরও শক্তিশালী করিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে আজ ইহা আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অহিংসা ও মানবতার ধ্বজাধারী 'বিশ্বাস'-এর এইরূপ দর্শনই উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে আপন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য কী ভাবে সহিংসরূপ (কান্ট অব ভায়োলেন্স) লইয়া বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে, গান্ধীবাদী কংগ্রেস সরকারের আচরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। আমাদের দেশে গান্ধীবাদই হইতেছে এই নয়া ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির স্তম্ভ স্বরূপ।

এইভাবে একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়িয়াই চলিয়াছে, অপর দিকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র', 'জাতীয় গণতন্ত্র', 'জনগণতন্ত্র' প্রভৃতি নানা ধরনের উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া মতবাদের বেড়াজালে আটকা পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে। কোনওমতেই পথ কাটিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। যেখানে শোষকশ্রেণীর শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখার ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনে দ্রুতগতিতে ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে সমস্ত প্রকার বুর্জোয়া উদারনৈতিক মতবাদ, মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও রিভাইভালিজম-এর ঝোঁক হইতে সংস্কৃতির মূল সুরটি বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে প্রগতিশীল বিপ্লবী সংস্কৃতি বা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য স্বীকার এবং মুখে ও লেখায় বিপ্লবের অপরিহার্যতার কথা স্বীকার করিলেও বেশিরভাগ সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী দলগুলি কার্যত পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বুর্জোয়া উদারনৈতিক ভাবধারার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনতার বিপ্লবী আন্দোলনও ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যেও তাই দিনের পর দিন শ্রেণীসংগ্রামের বিপ্লবী ভাবধারার পরিবর্তে প্রচ্ছন্নভাবে উদারনৈতিকতাবাদ, অর্থনীতিবাদ ও অস্তিত্ববাদের প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা যদি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়িয়া

তুলিতে চান তাহা হইলে এই ঐতিহাসিক সত্য তাঁহাদের উপলব্ধি করিতেই হইবে যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণবিপ্লবের মধ্য দিয়া বর্তমান পুঁজিবাদী, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতীত সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব। তাই যে সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা মনে করেন সমাজতন্ত্রই আজকে সমাজপ্রগতি ও জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র পথ, তাঁহারা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে ভিত্তি করিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে না পারিলে এবং গণআন্দোলন ও শ্রমিক-চাষীর প্রতিদিনকার শ্রেণীসংগ্রামগুলির সাথে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগসাধন করিতে সক্ষম না হইলে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা তাঁহাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না। প্রগতিশীল সর্বহারা সংস্কৃতি গড়িয়া তোলার প্রধান শর্ত হইল জনসাধারণের কাছে যাইতে হইবে, তাহাদের মধ্যে থাকিতে হইবে এবং তাহাদের প্রতিটি শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন ও সক্রিয় সহায়তা করিতে হইবে। সর্বোপরি জনসাধারণের জীবন হইতে শিখিবার মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপরন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যা বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সমাজের অগ্রগতি, সর্বপ্রকার শোষণ হইতে জনতার মুক্তি, শিল্প, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির পুঁজিবাদী মোটিভ অব প্রোডাকসন অ্যান্ড এক্সপ্রোপ্রিয়েশন (উৎপাদন ও শোষণের উদ্দেশ্য) -এর নাগপাশ হইতে মুক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের উপর। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া এই সত্য জনতার সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কোনও মতেই আলাদা করা চলিবে না। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেমের সাথে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের কোনও সত্যকার বিরোধ নাই বরং ইহারা একে অপরের পরিপূরক (মিউচুয়ালি কনডিউসিভ টু ইচ আদার)। বুর্জোয়াশ্রেণীর উগ্রজাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলই নয়, সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থ ও গোটা মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। কাজেই এ ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সর্বপ্রকার চালাকি ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকে ব্যর্থ করিতে হইলে, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের ধারণাকে, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা হইতে কোনও মতেই বিচ্ছিন্ন করা চলিবে না। এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ আর একটি কথা সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বহারা বিপ্লবী সংস্কৃতি, রুচি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কৃতি হইতে অধিকতর উন্নত, কাজেই সর্বহারাদের সংস্কৃতি চর্চার নামে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মানকে কোনওদিক হইতে নিম্নগামী হইতে দিলে চলিবে না। তর্ক- বিতর্ক ও আলাপ আলোচনার পথ যাহারাই রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে এবং যে কোনও বুলি বা ঝান্ডার আড়ালেই হোক না কেন গায়ের জোরে বিরুদ্ধ মতকে স্তব্ধ করিবার প্রয়াস পাইবে তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

এইভাবে আমাদের দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা যদি সমস্ত প্রকার বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাবাদ, মানবতাবাদ, রিভাইভালিস্ট টেন্ডেন্সি, শ্রেণীনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিয়া ইহাদের আসল রূপ জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিতে সক্ষম হন এবং সাথে সাথে শ্রেণীসংগ্রামের নীতি ও বিপ্লবের ভাবধারাকে যথাযথভাবে রূপ দিতে পারেন তবেই প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতিকে পরাস্ত করিয়া দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভবপর হইবে।

প্রবন্ধটি প্রথমে গণদাবী-র ১০ম বর্ষ,
১৯৫৭ সাল, নভেম্বর বিশেষ সংখ্যায় *এবং*
*পরে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে*
*১৯৬৬ সালের শারদীয়া দর্পণ-এ প্রকাশিত হয়।*